Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান শিমু

রোলঃ 216022028

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান শিমু

রোলঃ 216022028

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান শিমু, আইডিঃ 216022028 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shimu

(স্বাক্ষর)

ইসরাত জাহান শিমু

আইডিঃ 216021080

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

সূচনা

ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন সবকিছু দেখতে শুরু করলো বিজ্ঞান নামক চশমার ভেতর থেকে তখন পুঁজিবাদী আর ভোগবাদী সভ্যতার দরকার ছিল এমন কিছু সায়েন্টিফিক থিওরির যেগুলো অশ্লীলতা, বেহায়াপনা,বিকৃত যৌনাচারগুলোকে পায়ের তলায় মাটি দাঁড় করিয়ে দেবে। তারপর, পশ্চিমা বিশ্ব তাদের "যৌন বিপ্লব" রফতানি করা শুরু করলো। যৌনতার ব্যাপারে তাদের গবেষণা চাপিয়ে দিতে চায় বাকি বিশ্বের ওপর। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র তার সব ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিকৃত এজেন্ডা প্রতিষ্ঠিত করতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে চাচ্ছে।

বিকৃতি এই অভূতপূর্ব প্রসার ও স্বীকৃতি যে আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে সেটা পরিচিত LGBT Rights Movement নামে। LGBT একটি গুচ্ছ শব্দ যেখানে, L দ্বারা Lesbian বা নারী সমকামী, G দ্বারা Gay বা পুলিশ সমকামী, B দ্বারা Bisexual বা উভকামী এবং T দ্বারা ট্র্যান্সজেন্ডার।

সমকামিতা,পেডোফিলিয়া থেকে শুরু করে সকল বিকৃতি যৌনাচারের সর্বশেষ ফলাফল হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। মানবজাতিকে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত খাদে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার এক ভয়ঙ্কর প্রয়াস।

নারী পুরুষ নির্ধারণের এ নতুন ধারণা অর্থাৎ শারীরিক লিঙ্গ চিহ্নের বাইরে মানসিক বোধকে লিঙ্গ পরিচয়ের মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানো সকল আসমানী শরীয়ত এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত বিরোধী। এটি সর্বপ্রথম শুরু হয় অমুসলিমদের কাছ থেকে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) Trans এবং Gender যোগে গঠিত একটি শব্দ। Trans অর্থ হল রূপান্তরিত। Gender অর্থ লিঙ্গ। সুতরাং 'ট্রান্সজেন্ডার' মানে হল রূপান্তরিত লিঙ্গ। ট্রান্সজেন্ডারকে সংক্ষিপ্তাকারে কখনো শুধু 'ট্রান্স'ও বলা হয়। পরিভাষায় ট্রান্সজেন্ডার হল এমন ব্যক্তি, যার মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন থেকে ভিন্ন।

আরেকটু সহজভাবে বললে, ট্রান্সজেন্ডার মানে বিপরীত লিঙ্গের অনুসরণ। ট্রান্সজেন্ডার নারী বা ট্রান্সনারী মানে এমন একজন পুরুষ, যে নিজেকে নারী দাবি করছে,নারীর পোশাক পরছে, নারীসুলভ নাম রাখছে। তার জন্ম হয়েছে অন্ডকোষ আর পুরুষাঙ্গ নিয়ে। তার শরীরে আছে XY ক্রোমোসোম।

ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ বা ট্র্যান্সপুরুষ মানে এমন নারী, যে নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করছে। তার জন্ম জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনী এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব নিয়ে। তার দেহে আছে XX ক্রোমোসোম।

একদম সহজভাবে বললে, 'ট্র্যান্সজেন্ডার নারী' মানে হলো নারী সাজা পুরুষ। 'ট্র্যান্সজেন্ডার পুরুষ' মানে পুরুষ সাজা নারী। এমন কেউ যে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ পুরুষ কিন্তু সে নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেয়। সে মনে করে সে নারী। অথবা এমন কোনো নারী যে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দেয়। সে 'মনে করে' সে 'ভুল দেহে' আছে। এটা সম্পূর্ণ 'মনে করা'র ব্যাপার।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থান

প্রাথমিক সূচনা: ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের কৃতিত্বে প্রথম সারিতে আছেন গত শতকের চরম বিতর্কিত সেক্সোলজিস্ট ড. জন উইলিয়াম মানি। ১৯৫৫ সনে তার এক লেখায় তিনি 'জেন্ডার' শব্দকে সেক্স থেকে আলাদা করে ব্যবহার করেন। লেখাটি জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির বুলেটিন, জুন ১৯৫৫ সংখ্যায় ছাপা হয়। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ম্যাগাজিন SPIKED-এ বলা হয়েছে-

"In 1955, he was the first person to use the word 'gender' as opposed to 'sex' to draw a distinction between the biological attributes and the behavioural characteristics that differentiate males from females. He subsequently popularised terms like 'gender identity' and even founded the world's first gender-identity clinic at John Hopkins University in Baltimore in the US in 1966, specialising in the psychological and medical treatment of transgender patients. Above all, Money pushed the view, so central to today's trans movement, that though we may be born with biologically determined sex characteristics, they do not determine whether we are male or female. Without Money, it's unlikely that trans ideology, especially the phenomenon of 'trans kids', would exist today in the way that it does."

এ উদ্ধৃতির সারকথা হল, তিনিই (জন মানি) প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৯৫৫ সালে 'সেক্স'-এর বিপরীতে 'জেন্ডার' ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তিনি জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের পরিবর্তে আচরণগত পার্থক্যকে লিঙ্গ পরিচয়ের মানদণ্ড বানিয়েছেন। তিনি পরবর্তীকালে 'জেন্ডার পরিচয়' (gender identity)-এর মত শব্দগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সর্বোপরি

তিনি এ মত সামনে আনেন যে, আমরা যে লিঙ্গ পরিচয় নিয়েই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেটা আমরা পুরুষ, না নারী, তা নির্ধারণ করে না! জন মানিকে বলা হয়েছে যৌন স্বাধীনতাবাদী। অনেকেই তাকে বিকৃতিকারী আখ্যা দিয়েছে।

সেক্স ও জেন্ডার আইডেন্টিটির উপর তিনি যে পরীক্ষা চালিয়েছেন তা চরম বিতর্কিত হয়েছে। ইতিহাসে তা ডেভিড রেইমার কেইস নামে পরিচিত। তাতে তিনি ডেভিড রেইমার নামক একটি ছেলেকে মেয়ে বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। এটা করতে গিয়ে জন মানি যা করেছেন, তা ছিল অমানবিক, নোংরামি ও চরম ঘৃণ্য। ছেলেটি মেয়ে তো হয়নি, উপরন্তু তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তার দিন কাটছিল। পরিশেষে ৩৮ বছর বয়সে সে আত্মহত্যা করে।

ডেভিড রেইমার আত্মহত্যা করে ২০০৪ সালে, ততদিনে পশ্চিমা গবেষকদের হাত ধরে পাশ্চাত্যে এ মতবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। আর প্রভাবশালী বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় এবং মিডিয়ার প্রচারণায় এর ক্রমবিস্তার ঘটে।

গোড়ার ইতিহাস: ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা মোটামুটি নতুন। আগে সেটার নাম ছিল ট্র্যান্সসেক্সুয়াল (Transsexual)। নানান ঘটনা প্রবাহ আর তত্ত্বের মিশেলে ট্র্যান্সসেক্সুয়াল ট্র্যান্সজেন্ডার হয়ে উঠতে শুরু করে সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বংশগতি বুঝতে হলে তাই আমাদের শুরু করতে হবে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ইতিহাস দিয়ে। সেই ইতিহাসের শুরু বার্লিনে।

বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্য নিয়ে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বার্লিনে আস্তানা গেড়েছিল ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। শুরু করেছিল বিকৃতির সামাজিকীকরণের নানা উদ্যোগ। সমকামী আন্দোলনের জনক বলে পরিচিত ইতিহাসের এই বিচিত্র চরিত্রকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের গল্পেও এক কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখতে পাই আমরা।

সমকামী আন্দোলন নিয়ে কাজ করার সুবাদে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্তদের মধ্যে বিশেষ এক শ্রেণিকে চিহ্নিত করে ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। যারা এ ধরনের মানুষ বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজতে পছন্দ করে, এর মধ্যে যৌন আনন্দ খুঁজে পায়। এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে উভকামিতা, অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে যৌন সম্পর্কের প্রবণতা দেখা যায়। এ জাতের লোকেদের বর্ননা দিতে গিয়ে **১৯১০** সালে নতুন একটা শব্দ উদ্ভাবন করে হার্শফেল্ড-ট্র্যান্সভেস্টাইট (Transvestite)।

১৯২৩ সালে আরেকটা শব্দ উদ্ভাবন করে হার্শফিল্ড,ট্র্যান্সসেক্সুয়াল। এমন মানুষ, যারা চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের শরীরকে বিপরীত লিঙ্গের মতো করতে চায় স্থায়ীভাবে। সোজা বাংলায় ট্যান্সসেক্সুয়াল হলো ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মধ্যে বিশেষ একটা শ্রেণি, যারা 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করতে চায়।

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি, কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডও মনে করত, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত মানুষরা নারী ও পুরুষের বাইরে তৃতীয় একটা শ্রেণি। পুরুষের দেহে 'আটকা পড়া নারী'। এ তত্ত্বে হার্শফেল্ড কিছু পরিবর্তন আনলেও, মোটাদাগে সেটা উলরিখসের তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্বেরই একটা সংস্করণ হিসেবে থেকে যায়। এই তত্ত্ব ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থানে বড় একটা ভূমিকা রাখে। তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্বের আলোকেই তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করে হার্শফেল্ড। উলরিখস ও হার্শফেল্ডের চিন্তা থেকে আসা যুক্তির সিঁড়িটা অনেকটা এরকম-

• সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত পুরুষরা আসলে পুরুষ দেহে আটকা পড়া নারী সত্তা।

• সমকামী পুরুষদের অনেকে নিজেদের নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। নারীর পোশাক পরে, তাদের আচরণ অনুকরণ করে।

• এই চাওয়া যদি যথেষ্ট তীব্র হয়, তাহলে 'চিকিৎসা হিসেবে' অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এসব পুরুষের দেহকে নারীদেহের মতো করে দেওয়া যেতে পারে।

• এতে করে তাদের ভেতরের নারী সত্তার সাথে বাইরের দেহটা মিলবে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে সার্জারির প্রচলন: *এসব* তত্ত্ব ও ধারণার আলোকে ১৯২০-এর দশক থেকে তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করে হার্শফেল্ড। এক্ষেত্রে কাজে লাগায় তার গড়ে তোলা 'যৌন গবেষণা ইনস্টিটিউট'-কে। হার্শফেল্ডের তত্ত্বাবধানেই ১৯২২ সালে পৃথিবীর প্রথম 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি হয়। রোগী, রুডলফ রিকটার নামে একজন পুরুষ। ২০০১ সার্জারির পাশাপাশি রিকটারকে হরমোন 'চিকিৎসা' দেওয়া হয়।

পরের বছরগুলোতে আরও কয়েকজন রোগীকে লিঙ্গ পরিবর্তনের পরামর্শ দেবে হার্শফেল্ড ও তার দলবল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠে ডেনমার্কের আইনার ওয়েগেনার, যে পর 'লিলি এলবা' নামে পরিচিত হয়। আপাদমস্তক পুরুষ হলেও ওয়েগেনার নারী সাজতে পছন্দ করত। সে উভকামী ছিল। এক নারীর সাথে বিয়েও হয়েছিল তার। ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে হার্শফেল্ডের পরামর্শে মোট ৪টি অপারেশন করে সে। সর্বশেষ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েগেনারের দেহে জরায়ু প্রতিস্থাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ অপারেশন ব্যর্থ হয়। তিন মাস প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভোগার পর মারা যায় ওয়েগেনার। তার স্ত্রী বিখ্যাত একজন শিল্পী হওয়াতে এ অপারেশন এবং ওয়েগেনারের 'রূপান্তর'-এর খবর আলোড়ন তোলে ইউরোপের মিডিয়াতে। ব্যাপারটা অ্যামেরিকাতেও অনেকের নজরে আসে।

ওয়েগেনার যখন মরণ যন্ত্রণায় ভুগছে, হার্শফেল্ড তখন ব্যস্ত তার অ্যামেরিকা ট্যুর নিয়ে। এই ট্যুরে আয়োজকরা হার্শফেল্ডকে পরিচয় করিয়ে দেয় ইউরোপের 'প্রধানতম যৌন

বিশেষজ্ঞ' এবং 'যৌনতার আইনস্টাইন' নামে। অ্যামেরিকাতে ঘুরে ঘুরে নিজের বিকৃত ধ্যানধারণার ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় হার্শফেল্ড। এ ট্যুরের আয়োজকদের একজন ছিল হ্যারি বেঞ্জামিন। দুই দশক পর এই হ্যারি বেঞ্জামিনই হয়ে ওঠে অ্যামেরিকায় ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থানের পেছনে প্রধান কুশীলব।

১৯৩১ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ইউরোপে; বিশেষ করে সুইজারল্যান্ড এবং ডেনমার্কে, আরও কিছু 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি হয়। অ্যামেরিকাতে তখন এ ধরনের সার্জারি হতো না। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা প্রয়োগ ছিল না অ্যাটল্যান্টিকের ওপারে। এ অবস্থা বদলাতে শুরু করে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে।

হ্যারি বেঞ্জামিনের জন্ম বার্লিনে, ১৮৮৫ সালে। এখানেই তার বেড়ে ওঠা আর পড়াশোনা। এক পর্যায়ে সে স্থায়ীভাবে অ্যামেরিকা চলে যায়। মেডিসিনের ওপর পিএইচডি করলেও, যৌনতা সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে ভালোই আগ্রহ ছিল হ্যারি বেঞ্জামিনের। জার্মানিতে থাকা অবস্থায় সে হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিল। ছিল হার্শফেল্ডের অ্যামেরিকা ট্যুরের প্রধান আয়োজকও। অর্থাৎ, হার্শফেল্ডের তত্ত্ব, কাজ আর গবেষণার সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিল হ্যারি বেঞ্জামিন। তবে কথিত লিঙ্গ পরিবর্তন বা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে সে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে, এক অধ্যাপক বন্ধুর পরামর্শে। বেঞ্জামিনকে উৎসাহ দেওয়া সেই বন্ধুর নাম অ্যালফ্রেড কিনসি। কিনসির উৎসাহে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে জোরেশোরে কাজ শুরু করে বেঞ্জামিন।

ইংরেজি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যায় ট্র্যান্সসেক্সুয়াল শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৪৯ সালে। যৌনতা সংক্রান্ত মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। তবে শব্দটাকে জনপ্রিয় করে তোলে হ্যারি বেঞ্জামিন পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে লেখা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ব্যাখা দিতে গিয়ে সে বলে,

“ট্র্যান্সভেস্টিসিসম (বিপরীত লিঙ্গের অনুসরণ) অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রবল হতে পারে। এর ফলে এমনও হতে পারে, বিপরীত লিঙ্গের মতো হবার জন্য (রোগীর মধ্যে তার) দেহের ব্যাপারে ‘প্রকৃতির ভুল’ সংশোধনের ইচ্ছা কাজ করে। এ ধরনের (রোগীর) ক্ষেত্রে ‘ট্র্যান্সসেক্সুয়ালিজম’ শব্দটি যথাযথ বলে মনে হয়।”

ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের ধারণাগুলোকেই নিজের মতো করে উপস্থাপন করে বেঞ্জামিন । সেও বলে-ট্র্যান্সসেক্সুয়াল হলো এমন মানুষ, যে বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজতে চায়। এ চাওয়া অনেকের ক্ষেত্রে এতটাই তীব্র আকার ধারণা করে যে, তারা নিজেদের দেহকেও বদলে ফেলতে চায়। তারা নাকি 'তাদের পুরুষ দেহের ভেতর নারীসত্তা ধারণ করে'। এই প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে বেশি। বেঞ্জামিনের ভাষায়, 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালরা হলো পুরুষ ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মধ্যে সবচেয়ে অসুস্থ দল'। এ ধরনের লোকেদের ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসায় কাজ হয় না। এসব রোগীদের একমাত্র চিকিৎসা হলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন'। বেঞ্জামিন এবং তার সহকর্মী চার্লস ইহলেনফেল্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করে,

'পুরুষের শরীরে আটকা পড়া নারীর মন' বা 'নারীর শরীরে আটকা পড়া পুরুষের মন' থেকে যে দ্বন্দ জন্ম নেয়, সার্জারি এবং হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তা সমাধান করা সম্ভব।’

উলরিখস এবং হার্শফেল্ডের তৃতীয় লিঙ্গ আর ভুল দেহে আটকা পড়া-র তত্ত্বই প্রচার করে হ্যারি বেঞ্জামিন। তবে মজার ব্যাপার হলো, বেঞ্জামিন তার গবেষণার পেছনে অ্যালফ্রেড কিনসির পরামর্শের ভূমিকার কথা স্বীকার করলেও, হার্শফেল্ডের কথা বেমালুম চেপে যায়।

লেখালেখির পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকে রোগীও দেখে বেঞ্জামিন, এবং তাদের 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' পরামর্শ দেয়।। অ্যামেরিকাতে সার্জারির সুযোগ না থাকায় অপারেশনের জন্য সে তার রোগীদের পাঠায় ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা, ইস্তাম্বুল, ডেনমার্ক কিংবা সুইজারল্যান্ডের মতো

জায়গায়। এমনই এক রোগী জর্জ জর্গেনসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা জর্জ ১৯৫২ সালে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করায় ডেনমার্কে। নতুন নাম নেয় ক্রিস্টিন জর্গেনসেন। নিজের 'রূপান্তর' এর খবর গোপন রাখার চেষ্টা করলেও, কীভাবে কীভাবে যেন পত্রিকাওয়ালাদের কাছে তা পৌঁছে যায়। রসিয়ে রসিয়ে জর্গেনসেনের অপারেশনের খবর প্রচার করে পত্রিকাগুলো। 'লিঙ্গ পরিবর্তন'-এর ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানতে শুরু করে। মেডিক্যাল ফিল্ডেও বেড়ে যায় ট্র্যানসেক্সুয়ালিসম নিয়ে লেখালেখি। গতিশীল হয় হ্যারি বেঞ্জামিনের গবেষণা এবং প্রচারণা।

এবার বেঞ্জামিন মনোযোগী হয় অ্যামেরিকাতে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি চালু করার দিকে। ১৯৬৪ সালে নিজের নামে ফাউন্ডেশন খোলে সে। দু বছর পর, ৬৬ তে প্রকাশিত হয় তার লেখা বই, 'দা ট্রান্সসেক্সুয়াল ফেনোমেনন'। মজার ব্যাপার হলো, সে বছরেই তার উদ্যোগে চালু হয় অ্যামেরিকার প্রথম জেন্ডার ক্লিনিক। যে রোগকে বেঞ্জামিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তার কথিত সমাধান নিয়ে হাজির হয় সে নিজেই। ব্যাপারটাকে কেউ হয়তো কাকতালীয় বলবেন, আবার কেউ হয়তো বলবেন তুখোড় ব্যবসায়িক বুদ্ধি।

নিজের ফাউন্ডেশনের জন্য একটা গবেষণা দল তৈরি করে বেঞ্জামিন। এ দলের সদস্য ছিল হার্ভার্ড থেকে পাশ করা জন মানি। তার অদ্ভুত তত্ত্ব ছিল অনেকটা এমন, 'মানুষের দেহ জন্মগত, কিন্তু তার আত্মপরিচয়ের অনুভূতি সামাজিকভাবে নির্মিত। মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মায় না। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে 'নারী' অথবা 'পুরুষ' হয়ে উঠতে শিখে। মানুষের পরিচয় ও যৌনতা দুটোই পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট নির্ভর। অপরিবর্তনীয় কিছু না। মানুষ কী ধরনের শরীর নিয়ে জন্মাচ্ছে, তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানসিকভাবে সে কোন লৈঙ্গিক ভূমিকা বা Gender Role গ্রহণ করছে।'

এই তত্ত্ব দিয়ে দেহ আর পরিচয়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে মানি। তার প্রচার করা ধারণা লুফে নিয়ে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা 'লিঙ্গ পরিচয়' নামে আরেক ধারণা প্রস্তাব করে

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ড. রবার্ট স্টোলার। এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার হয় লিঙ্গ পরিবর্তনের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা তৈরিতে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'দা ট্যান্সসেক্সুয়াল ফেনোমেনন' বইতে হ্যারি বেঞ্জামিন লেখে,

‘সেক্সের অবস্থান নাভির নিচে, জেন্ডারের অবস্থান নাভির ওপরে’

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় জরগেনসেনের আত্মজীবনী। আবারও ব্যাপক হাইপ উঠে মিডিয়াতে। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ তথা 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' ধারণা ব্যাপকভাবে পৌঁছে যায় জনমানুষের কাছে। একই বছর বিখ্যাত জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা ক্লিনিক চালু হয় 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে। জনস হপকিন্সকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল স্কুলগুলোর একটা মনে করা হয়। এখানে এই ক্লিনিক চালু হওয়ার পর চিকিৎসাবিদ্যা ও গবেষণার জগতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায় ট্র্যান্সসেক্সুয়ালিসম।

খুব দ্রুত এ ধরনের সার্জারির চল শুরু হয় আরও অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে।

এক জরিপ অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে ‘লিঙ্গ পরিবর্তনের’ রোগীদের গুরুত্ব সহকারে নিতো নিতো মার্কিন সার্জনদের মাত্র ৩%। কিন্তু ১৯৭৫ নাগাদ এ ধরনের সার্জারি হচ্ছিল বিশটি বড় বড় মেডিক্যাল সেন্টারে। কি। এরই মধ্যে সার্জারি করিয়ে ফেলেছিল অ্যামেরিকার কয়েক হাজার মানুষ। মাত্র বিশ বছরের মধ্যে প্রায় অজ্ঞাত এক তত্ত্ব থেকে মেডিক্যাল গবেষণার বৈধ ফিল্ডে পরিণত হয় ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ।

২০০৬ সালে হ্যারি বেঞ্জামিনের ফাউন্ডেশনের নাম বদলে ফেলা হয়। নতুন নাম রাখা হয় World Professional Association for Transgender Heals সংক্ষেপে WPATH। বর্তমানে WPATH-কে ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রধান প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। নিজেদের যারা বিপরীত লিঙ্গের বলে দনি করে, তাদের 'চিকিৎসা' কীভাবে হবে

তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড টির করে এই WPATH। হ্যারি বেঞ্জামিনের তৈরি ফাউন্ডেশন।

হ্যারি বেঞ্জামিন ধুরন্ধর উদ্যোক্তা ছিল। অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাষায় বললে, বেঞ্জামিন প্রথমে একটা জিনিসের চাহিদা তৈরি করে। তারপর নিজেই সেটার যোগান নিয়ে হাজির হয়। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে বেঞ্জামিন যখন ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ বা 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' মতবাদ প্রচার শুরু করেছিল, তখন এ শব্দটাও ছিল ইংরেজি ভাষাতে আনকোরা নতুন। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, চিকিৎসক এবং গবেষকদের কাছেও অপরিচিত ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু যাটের দশকের শেষ নাগাদ বই, অ্যাকাডেমিক জার্নাল আর বিশ্বব্যাপী লেকচার ট্যুরের মাধ্যমে এ তত্ত্ব পৌঁছে যায় চিকিৎসক ও গবেষকদের কাছে।

ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের ঝড়োগতির প্রসারের পিছনে এরিকশন ফাউন্ডেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৬৩ সালে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি জন্যে বেঞ্জামিনের কাছে হাজির হয় রিটা অ্যালমা এরিকসন নামে ৪৬ বছর বয়সী এক নারী। রিটা ছিল ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর বছরগুলোতে কয়লার ব্যবসা করে প্রচুর টাকা বানিয়ে নিয়েছিল তার বাবা। রিটা সেই বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। রিটা আসক্ত ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায়। বিশাল বড়লোকের মেয়ে হবার কারণে তাকে কেন্দ্র করে সমকামী নারীদের একটা বলয় গড়ে উঠেছিল অ্যামেরিকার লুইসিয়্যানাতে। নিজের সমকামিতা নিয়ে খুব একটা রাখঢাক করতো না রিটা। বাবার প্রাচুর্য ও প্রভাবের কল্যাণে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হতো না তাকে। পঞ্চাশের দশকে হ্যারি বেঞ্জামিনদের কল্যাণে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ধারণা যখন পরিচিত হতে শুরু করলো, জর্গেনসেনের 'রূপান্তর' নিয়ে মিডিয়া যখন পুরো দেশে শোরগোল বাধিয়ে দিল, তখন রিটার মাথায় নতুন এক ভূত চাপলো। তার মনে হলো, সে এখন পুরুষ হতে চায়। ১৯৬২ সালে রিটার বাবা মারা গেল। সাম্রাজ্য এসে গেল রিটার হাতে। পরের বছর সে হাজির হলো হ্যারি বেঞ্জামিনের চেম্বারে।

বেঞ্জামিনের সহায়তায় ১৯৬৫ সালে অপারেশন করে 'পুরুষহলো' রিটা এরিকসন। নতুন নাম দিলো রীড এরিকসন। এরিকসন তারপর এমন একটা কাজ করলো, যা পরে সদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্ব এবং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থান ও প্রসারে। হ্যারি বেঞ্জামিনের সাথে পরিচয়ের এক বছরের মাথায় ১৯৬৪ সালে নিজ নামে একটা ফাউন্ডেশন খুললো সে-এরিকসন এডুকেশন ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ ডলারের অনুদান দিলো বেঞ্জামিনকে। এরিকসনের টাকা দিয়েই চালু হলো হ্যারি বেঞ্জামিনের ফাউন্ডেশন। তারপর এরিকসন মনোযোগ দিলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ষাট ও সত্তরের দশকে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে যত কাজ হয়েছে, তার প্রায় সবকিছুর পেছনে রিটা এরিকসনের চেকবই আর এরিকসন ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের তত্ত্বকে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এরিকসন ফাউন্ডেশনের ভূমিকাকে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- ***সামাজিকীকরণ:*** ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রতি মেডিক্যাল ফিল্ড এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বেশ কিছু কাজ করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। যেমন,

•'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে প্রতি বছর মেডিক্যাল সিম্পোসিয়ামের আয়োজন করা ও খরচ যোগানো। ফাউন্ডেশনের খরচে বাছাই করা ডাক্তার ও মনোবিদদের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। সেখানে গিয়ে তারা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে লেকচার দিতো। 'বাছাই করা' ডাক্তার ও মনোবিদদের মধ্যে ছিল জন মানির মতো লোকজন। মানি এই ফাউন্ডেশনের বোর্ডের সদস্যও ছিল।

•মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাদার সংখ্যার মিটিংয়ে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন।

• শর্টফিল্ম, পুস্তিকা আর লিফলেটের মাধ্যমে ডাক্তার, মনোবিদ, উকিল, পুলিশ, পাদ্রী এবং সামাজিক কর্মীদের মধ্যে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে সচেতনতা তৈরি।

- ***অনুদান*** : ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে গবেষণা এবং 'লিঙ্গ পরিবর্তন' ক্লিনিক স্থাপনের জন্য উদার হস্তে টাকা ঢেলেছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন। একটু আগে জনস হপকিন্সের যে ক্লিনিকের কথা বললাম, সেটার পেছনেও ছিল এরিকসনের টাকা। অনুদানের সব টাকা যেত বেঞ্জামিন ফাউন্ডেশনের হাত ঘুরে।

- ***রোগী সেবা:*** লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয় এরিকসন ফাউন্ডেশন। যেমন:

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তারা একটা নিউসলেটার প্রকাশ করে, যার গ্রাহক সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের বেশি। লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে সামসময়িক গবেষণার সারমর্ম এই নিউসলেটারে তুলে ধরা হতো। অ্যামেরিকা জুড়ে আগ্রহী মানুষদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই প্রকাশনা।

সহজে অপারেশন করতে রাজি হয় এমন ২৫০ জনের বেশি ডাক্তারের লিস্ট তৈরি করেছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন। নিউসলেটারের সুবাদে তৈরি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তালিকার নামগুলো পৌঁছে যায় লিঙ্গ পরিবর্তনে ইচ্ছুক লোকেদের কাছে।

ইন্সুরেন্স কোম্পানি, নগর ও প্রাদেশিক কল্যাণ সংস্থা, এমনকি কারিগরি শিক্ষা ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করা নানা প্রতিষ্ঠানকেও লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের অর্থায়ন করতে রাজি

করায় এরিকসন ফাউন্ডেশন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগানো খরচে অনেক লোকের অপারেশন হয়।

স্যান ফ্রানসিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে মিলে 'জাতীয় ট্র্যান্সসেক্সুয়াল কাউন্সেলিং ইউনিট' তৈরি করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। এ ইউনিটের কাজ ছিল সার্জারি করা লোকেদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা। সার্জারি করেনি এমন পুরুষদের নারী সেজে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতিপত্র দিতেও পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগকে রাজি করায় এই ফাউন্ডেশন।

সার্জারি করা লোকেদের নতুন জন্ম সনদ দেওয়ার জন্য অ্যামেরিকা জুড়ে রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের লোকদের পেছনে লবিয়িং করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। সফলও হয়। এতে করে অপারেশনের পর নতুন জন্ম সনদ পাওয়ার পথ খুলে যায়।

এভাবে লিঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারে মেডিক্যাল ফিল্ড ও প্রশাসনের মনোভাব ও চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। তৈরি করে আইনি বৈধতার ভিত্তি, গড়ে তোলে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক।

***

এরিকসন ফাউন্ডেশনের কর্মপদ্ধতির সাথে অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের সায়েন্টিফিক হিউম্যানিটেরিয়ান কমিটির কার্যক্রমের। যেমন মিল পাওয়া যায় হ্যারি বেঞ্জামিনের প্রচারিত 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের' সাথে হার্শফেল্ডের দেওয়া তত্ত্বের। বেঞ্জামিনের একদিকে হার্শফেল্ডের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল, অন্যদিকে এরিকসন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাথেও সে যুক্ত ছিল অন্তরঙ্গভাবে। তাই হার্শফেল্ডের তৈরি ছকটাই সামান্য বদলে নিয়ে বেঞ্জামিন বাস্তবায়ন করছিল, এমন বলাটা ভুল হবে না। তবে হার্শফেল্ডকে

সে যথাযথ কৃতিত্ব দেয়নি। লোভীর মতো সব প্রশংসা, স্তুতি আর কৃতিত্ব শুষে নেবার চেষ্টা করেছে একাই।

হার্শফেল্ডের মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরে মুন্সিয়ানার সাথে তার কৌশলগুলো কাজে লাগায় এরিকসন ফাউন্ডেশন। আবার আশির দশকের শেষ দিকে এই একই কৌশলগুলো গ্রহণ করে সমকামী অধিকার আন্দোলন। পায় ব্যাপক সাফল্য। আর এই কৌশলগুলোরই মাধ্যমে, ডাক্তার-তাত্ত্বিক-দাতা এবং রোগীর যোগসাজসকে কাজে লাগিয়ে, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দুই দশকে সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে যায় ট্যান্সজেন্ডার মতবাদ।

ট্রান্সজেন্ডার নামক বিকৃত মতবাদের প্রধান দাবিসমূহ*:*

ক. মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার অনুভূতি আর মনের চাওয়ার উপর। নিজেকে সে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, নিজেকে যে নারী দাবি করবে তাকে নারী বলে নিতে হবে। যদিও তার মাসিক সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে থাকে শতভাগ সুস্থ। নিজেকে যে পুরুষ দাবি করবে তাকে আইনী ও সামাজিকভাবে মেনে নিতে হবে পুরুষ হিসেবে।

খ. মানুষ ইচ্ছেমতো নারী বা পুরুষের পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওষুধু আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের দেহকে বদলে নেবে। কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও সবাইকে মেনে নিতে হবে।

গ. এ সকল উদ্ভট দাবীর ব্যাপারে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনো বাধা দিতে পারবে না। বরং মানবাধিকারের নামে 'সুবিধা- বঞ্চিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে

আপনার ট্যাক্সের টাকায় বিশেষ সুবিধা। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে যে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।

ঘ. এ মতবাদের অবধারিত ফলাফল হলো সমকামিতা ও বিকৃত যৌনতা। এগুলোকেও অধিকারের নামে মেনে নিতে হবে, স্বীকৃতি দিতে হবে।

বিকৃত ট্র্যান্সজেন্ডার মানুষের বৈশিষ্ট্য:

• ***পুরুষতান্ত্রিক:*** লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষের অধিকাংশ পুরুষ। হ্যারি বেঞ্জামিনের ১৯৬৬ সালের হিসেব অনুযায়ী 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করতে চাওয়া নারী ও পুরুষদের অনুপাত ১:৮। আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল লিটারেচর অনুযায়ী অনুপাত হলো ১:৩। ২০২৩ এর এক গবেষণা বলছে অ্যামেরিকাতে লিঙ্গ পরিবর্তন করা রোগীদের প্রায় ৬০% পুরুষ। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে বেশি।

•***বিকারগ্রস্ত:*** এ ধরনের মানুষের মধ্যে বাতিকগ্রস্থতা, আত্মহত্যার প্রবণতাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যা স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বেশি। যেমন, তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা স্বাভাবিক মানুষের প্রায় তিন গুণ। মাদক ব্যবহারসহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের প্রবনতাও আশংকাজনক মাত্রার। হার্শফেল্ডের সময় থেকে অনেকেই বলে আসছেন, সার্জারি এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখনো বলা হচ্ছে এসব কথা। যদি সার্জারি সহজলভ্য হয়, যদি সমাজ তাদের মেনে নেয়, তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মিডিয়া এ ধরনের বার্তা মাথায় গেঁথে দেবার চেষ্টা করছে ক্রমাগত।

কিন্তু বাস্তবতা তাদের এসব দাবিকে ভুল প্রমাণ করেছে। এ ধরনের মানুষদের নিয়ে গভীরভাবে কাজ করা ডাক্তাররাই বলছেন, সার্জারি তাদের মানসিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে না। এই উপসংহারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে একের পর এক গবেষণা ও পরীক্ষায়। সার্জারির পরও এ ধরনের মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাসহ অন্যান্য মানসিক সমস্যার হার স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। তবে মতাদর্শিক কারণে এই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে নানাভাবে।

•***নারীত্বের ক্যারিক্যাচার:*** অপারেশন করে নারী সাজতে চাওয়া পুরুষরা নারীত্বের একটা কাল্পনিক, অতিরঞ্জিত ছবি আঁকে। মনোবিদ ও ডাক্তারদের কাছে দেওয়া তাদের সাক্ষাৎকার থেকে একটা বাস্তবতা বারবার ফুটে ওঠে, নারী হবার অর্থ, নারীর দায়িত্ব, কর্তব্য, ভূমিকা-কোনোকিছু নিয়েই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এ ধরনের পুরুষদের। আগ্রহও নেই তাদের। তারা নারী হওয়া বলতে বোঝায় দামি, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, চকচকে অলঙ্কার, বিনুনী করা লম্বা চুল, কড়া মেইকআপের মতো বাহ্যিক কিছু বিষয়ক। নারীত্বের একটা ক্যারিক্যাচার তৈরি করে তারা। ড. পল ম্যাকহিউয়ের এ ব্যাপারটা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

‘সার্জারি করা রোগীদের আমার কাছে নারীর ক্যারিক্যাচার মনে হয়েছে। তারা হাই হিলের জুতো, কড়া মেইকআপ আর চটকদার পোশাকে নিজেদের সাজাতো। তারা বলত, সার্জারি করার পর শান্তি, স্বস্তি, কমনীয়তা আর ঘরোয়া পরিবেশের প্রতি তারা তাদের সহজাত প্রবণতা প্রকাশ করতে পারছে। কিন্তু তাদের বড় বড় হাত, উঁচু অ্যাডামস অ্যাপেল, আর মুখের পুরু বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল (তাদের কথার সাথে) বেমানান। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলো (নারী পরিচয়ের সাথে) আরও বেমানান হয়ে উঠবে। এ ধরনের রোগীদের আমি যেসব নারী মনোবিদদের কাছে পাঠাতাম, তারা সহজাতভাবে বেশভূষা আর অতিরঞ্জিত অঙ্গভঙ্গির আড়ালের বাস্তবতা ধরে ফেলতেন। নারী মনোবিদদের একজন আমাকে বলেছিল, 'মেয়েরা মেয়েদের চেনে, আর ওটা একজন পুরুষ।’

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এমন কোনো পুরুষ পাওয়া যায় না যে মধ্যবয়সী, সাদামাটা পোশাক পরা, উগ্র মেকাপের ফর্মুলা এড়িয়ে চলা তিন বাচ্চার মায়ের মতো শরীর চায়। বরং তারা হাই হিল পরা, বিশাল বক্ষা, প্রকট মেইকআপ আর উগ্র পোশাকের এমন এক নারীর মতো হতে চায়, যার সাথে দৈনন্দিন জীবনের নারীদের তেমন একটা মিল নেই। তাদের কাছে নারী মানেই কামার্ত, অতি আহ্লাদী, অতি যৌনায়িত। নারী দুর্বল, পরনির্ভরশীল এক জীব, যে সবসময় পরচর্চা, গালগল্প আর কেনাকাটা নিয়ে মগ্ন থাকে। কাল্পনিক এই নারীর অস্তিত্ব বাস্তব দুনিয়াতে নেই, আছে পর্নোগ্রাফির জগতে।

পুরুষের চোখ দিয়ে দেখে তারা নারীত্বের খণ্ডিত এক ছবি আঁকে, তারপর সেই ছবি অনুকরণের চেষ্টা করে। আর এর মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে চায় পুরুষকে। তাদের 'নারী হবার' ইচ্ছার সাথে নারীত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে আত্মতৃপ্তি, যৌনতা আর ফ্যান্টাসির।

বিকৃত যৌনতা ও ফ্যান্টাসি:

লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতার পুরো ব্যাপারটাকে নিরেট আত্মপরিচয়ের সংকট হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের মানুষের 'আত্মপরিচয়ের সংকট' নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়। এর মাধ্যমে সুচারুভাবে চাপা দেওয়া হয় এর পেছনে যৌনতা আর যৌন ফ্যান্টাসির ভূমিকা। বাস্তবতা হল, কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বিকৃত যৌনতা আর ফ্যান্টাসি। লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষের মধ্যে তীব্র ফ্যান্টাসি কাজ করে, যার অনেকগুলো যৌনতাকেন্দ্রিক। এদের মধ্যে সমকামিতা বা উভকামিতার প্রবণতা দেখা যায়।

মোটাদাগে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়ার প্রবণতার পেছনে দুটি কারণ কাজ করে আছে,

• মানসিক অসুস্থতা

• যৌন বিকৃতি

মানসিক রোগ: কিছু মানুষ এক ধরনের মানসিক রোগে ভোগে, যার ফলে নিজের শরীর ও আচরণ নিয়ে তাদের মধ্যে অস্বস্তি কাজ করে। সাধারণত এটা শুরু হয় বয়ঃসন্ধির সময় থেকে। একসময় তারা মনে করতে শুরু করে, তাদের শরীর বিপরীত লিঙ্গের মতো হলে এ অস্বস্তি থেকে তারা মুক্তি পাবে। আগে এ রোগকে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (Gender Identity Disorder) বলা হতো। বর্তমানে বলা হচ্ছে জেন্ডার ডিসফোরিয়া (Gender Dysphoria)। এ ধরনের সমস্যা যাদের মধ্যে দেখা যায়, সাধারণত তাদের ডিপ্রেশনসহ অন্যান্য আরও অনেক মানসিক সমস্যা থাকে। এছাড়া এ ধরনের মানুষের অনেকে শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। যা নিজ শরীর ও যৌনতা নিয়ে তাদের চিন্তায় নানা ধরনের জটিলতা নিয়ে আসে।

যৌন বিকৃতি: বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করার পেছনে দ্বিতীয় কারণটা বিকৃত যৌনতা। বিশেষ করে নারী সাজা পুরুষদের ক্ষেত্রে। কিছু পুরুষ নিজেকে নারী হিসেবে চিন্তা করে, নারীর পোশাক পরে যৌন আনন্দ লাভ করে। এটা এক ধরনের যৌন বিকৃতি, যার একটা নাম আছে, অটোগাইনেফিলিয়া (Autogynephillia) শাব্দিকভাবে এর অর্থ 'নিজেকে নারী হিসেবে কামনা করা'। এ বিকৃতিকে নারীত্ব ও যৌনতা নিয়ে ফ্যান্টাসি এবং বিকৃত যৌনতার মিশেল হিসেবে দেখা যায়।

অটোগাইনেফিলিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কেউ হয়তো খোলামেলা পোশাকের নারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়, কেউ হয়তো নারীসুলভ দেহকাঠামো চায়,

কেউ হয়তো নারীসুলভ আচরণ করতে চায়, আর বড় একটা অংশ যৌনকর্মে নিতে চায় নারীর ভূমিকা। তবে অটোগাইনেফিলিয়া থাকা পুরুষদের মধ্যে সবাই কেবল অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় আকৃষ্ট হয় না, এদের একটা অংশ উভকামীও হয়। অটোগাইনেফাইলদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে বয়ঃসন্ধির সময় যৌন ফ্যান্টাসি, হস্তমৈথুন এবং নারী সাজা-এই তিনটি উপাদানের মিশ্রণ দেখা যায়।

অন্যদিকে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করতে চাওয়া মানুষের বড় একটা অংশ বিকৃত যৌনতায় আসক্ত। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের বিকৃত যৌনতাকে সমাজের চোখে বৈধ করে তোলার জন্য তারা সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'লিলি এলবা' থেকে 'ক্রিস্টিন অর্গেনসেন', রিটা এরিকসন থেকে হাল আমলের অনেক ট্র্যান্সজেন্ডার 'আইকন'- এর 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাদের বিকৃত যৌনতার প্রবণতা।

বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক সময়ে সার্জারি করে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে সেই একই বৈশিষ্ট্য। বারডেম হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ফিরোজ আমিন লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

“আমার এক রোগী যেমন আছে, সে না বুঝে মেয়ে হয়ে গেছে। এটা একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি... আমি তাকে বললাম, তুমি এটা কেন হয়েছো? সে বললো, আমার আসলে নরমাল (স্বাভাবিক) সেক্স ভালো লাগত না। সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির কারণে সে মেয়ে হয়েছে। সে ছেলে; কিন্তু সে আরেকটা ছেলের সাথে মেয়ে হিসেবে (মেয়ের ভূমিকায়) মেলামেশা করছে।”

শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর 'সেক্স চেইঞ্জ' অপারেশনের কথা দেশি মিডিয়াতে আলোচিত হয়েছে। এই নারী শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু অন্য 'নারীর প্রতি আকৃষ্ট' হবার

কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছে। নাম নিয়েছে জিবরান সওদাগর। দেশি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তার বক্তব্য দেখা যাক,

জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি...একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেত না।...

....জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন....

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শারমিন আক্তার নামের এ নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিল। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল, যে কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সে নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন।

লিঙ্গ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বিকৃত যৌনতা ও ফ্যান্টাসি।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডা:

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনাচার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষে দিকে। এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য, গবেষণা এবং যৌন অধিকার, সমকামী অধিকার, যৌন শিক্ষা এবং ট্র্যান্সজেন্ডার এই চারটি পর্যায়ের প্রতিটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন হয়েছে

বিদেশি কানেকশন আর মিডিয়া, সুশীল সমাজ, প্রগতিশীল সর্মথক ভূমিকার কারণে। ২০১৬ সালের পর বাংলাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামনে আনে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে। এই পরিবর্তনের পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। ২০১৫-এর পর থেকে পশ্চিমা দাতারা ক্রমেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে অর্থায়নও শুরু করে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতারা। সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাতাদের পছন্দ, কৌশল মূল্যায়নসহ নানা দিক বিবেচনা করে দেশীয় এনজিও এবং সংগঠনগুলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে সামনে রেখে কাজে মনোযোগী হয়। আর এজন্য কাজে লাগায় হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গের মত শব্দগুলোকে।

ট্রান্সজেন্ডার এবং জন্মগত হিজড়া আলাদা:

মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ট্রান্সজেন্ডারদের হিজড়া হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। জন্মগত হিজড়াদের ব্যাপারে থাকা সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। ট্রান্সজেন্ডার এবং জন্মগত হিজড়া সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

*অভিধান অনুযায়ী হিজড়া শব্দের ইংরেজি ট্রান্সজেন্ডার নয়, বরং Hermaphrodite বা Intersex, জন্মগতভাবে তাদের শরীরে কিছু ত্রুটি থাকে

*ট্রান্সজেন্ডার হলো শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের এক ধরণের মানসিক বিকৃতি, এরা সমকামিতায় আসক্ত।

*মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে একজন মানুষ জন্মগত হিজড়া কিনা তা সনাক্ত করা যায়, কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার নিছকই মনের দাবী।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অপর পিঠ হল সমকামিতা। বাংলাদেশে যারা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করছে, তাদের সমকামিতায় লিপ্ত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে শারমিন আক্তার ঝিনুক ওরফে জিবরান সওদাগর নামে এক নারীর বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এই নারী নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তার বক্তব্য,

"*আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি পুরুষদের চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেতো না*"

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে শারমিন আক্তার ছিল শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নারী। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল। এই কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সে নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছে, অর্থাৎ নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার দাবি করছে। এখন আবদার করছেন আইন ও সমাজ তাকে যেন মেনে নেয় পুরুষ হিসেবে। এটি স্পষ্ট সমকামীতা এবং বিকৃতি ছাড়া আর কী?

এ অপরাধের কারণে মহান আল্লাহ, নবী লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়েছেন যা পবিত্র কুরআনে আমাদের জানানো হয়েছে। অথচ এই মতবাদ আজ আপনার শিশুকে শেখানো হচ্ছে পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে সরাসরি সমকামিতার পক্ষে কর্মকাণ্ড চালানো যেহেতু কঠিন তাই, জন্মগত হিজড়াদের প্রতি সমাজের মানুষের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রান্সজেন্ডার নামে চলছে অপতৎপরতা । মানবাধিকারের নামে চলছে বিকৃতির প্রচার ও প্রসার। ট্রান্সজেন্ডার

মতবাদের প্রসারে সক্রিয়ভাবে যারা কাজ করছে, এদের প্রায় সবাই সমাজে সমকামিতার প্রচার ও প্রসারেও কাজ করেছে কিংবা করছে।

এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে পশ্চিমা বিশ্ব ও দাতাদের মদদপুষ্ট বিভিন্ন দেশীয় এনজিও। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ, নো পাসপোর্ট ভয়েস, ব্র্যাকের অধীনে পরিচালিত সমতন্ত্র ইত্যাদি। সমকামিতা আন্দোলনের সাথে তাদের সম্পর্কের কথাও নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছে তারা। পাশাপাশি ইতিবাচক সংবাদ, সাক্ষাৎকার, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারী সাজা পুরুষদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে নীতিহীন দেশীয় নিউজ মিডিয়া ও বিনোদন জগত। সবচেয়ে আশংকাজনক ব্যাপার হল, রীতিমতো আইন প্রনয়ন করে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা সমকামী এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলমান।

হিজড়া শব্দের রাজনীতি এবং এজেন্ডা প্রচার:

অনেকেই মনে করেন ট্র্যান্সজেন্ডার মানে 'হিজড়া' বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সেলেব্রিটিও নিয়মিত এমন কথাবার্তা বলে। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। ট্র্যান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স (হিজড়া) এক না।

ইন্টারসেক্স বা 'হিজড়া' হল এমন কেউ যাদের শারীরিক গঠনে, বিশেষ করে যৌনাঙ্গের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মিশ্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এটাকে disorder of sex development (DSD)-ও বলা হয়। এমন মানুষদের ক্রোমোসোমের ডিসঅর্ডার বিসদৃশতা কাজ করে। ৪৬ ক্রোমোসোমের বদলে অনেকের ৪৭,৪৮, কিংবা ৪৯ টি ক্রোমোসোম থাকে। সর্বশেষ

জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন True Hermaphrodite বা intersex ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ০.০৫%।

সংক্ষেপে বললে হিজড়াদের ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাবে বায়োলজিক্যাল বা শারীরবৃত্তীয় কিছু বিষয় থাকে। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে বিষয়টা মানসিক। এই পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন হিজড়াকে যদি তার শারীরিক গঠনের কারণে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় তবে সেটা অবশ্যই অনাকাঙ্ক্ষিত। সমাজে তাদের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু, কোনো আপাদমস্তক পুরুষ যখন নিজেকে “নারী” দাবি করবে এবং প্রগতিশীলতা, মানবিকতা এবং আধুনিকতার নামে আমাদেরকে তাদের দাবিকে মেনে নিতে বলা হবে,তখন সেটা কালেক্টিভ ডিলিউশন,ম্যাস সাইকোসিস- সামষ্টিক বিভ্রান্তি।

পশ্চিমে গত কয়েক বছরে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে বিশ বছর সংসার করার পর ৫-৬ বাচ্চার বাবা নিজের পরিবার ছেড়ে চলে গেছে, এবং সে এখন ৭ বছর বয়েসী 'খুকী হিসেবে' জীবনযাপন করছে। অথবা সন্তান জন্মের পর বাচ্চার বাবা হঠাৎ করে 'নারী হিসেবে' জীবনযাপন করছে, আর মা 'পুরুষ হিসেবে'। এখানে 'নারী হিসেবে জীবনযাপন করা' এর অর্থ হলো নিজেকে নারী পরিচয় দেয়া, মেইকআপ করা, নারীদের পোশাকপড়া, অতিরঞ্জিত নারীসুলভ অঙ্গভঙ্গি এবং বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, ইত্যাদি। অনেক সময় এধরণের মানুষ অপারেশনের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করে। গত এক দশকে এই প্রবণতা অনেক বেড়েছে।

তাই হিজড়া/ইন্টারসেক্স এবং ট্র্যান্সজেন্ডারকে একসাথে মিলিয়ে দেখা ভুল। হিজড়াদের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটি সহানুভূতি কাজ করে, যেটাকে কাজে লাগিয়ে অনেকে চেষ্টা করে ট্র্যান্সজেন্ডার বিষয়টাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে। কিন্তু যারা নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার বলে দাবি করে তারাও এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য জানে এবং স্বীকার করে।

কাজেই কেউ যদি ট্র্যান্সজেন্ডার এবং হিজড়া/ইন্টারসেক্সকে এক করে উপস্থাপন করে তাহলে সে দুটোর একটা –

"হয় সে এ বিষয়ে জানে না। না জেনে কথা বলছে, অথবা, সে জানে, কিন্তু ইচ্ছে করে মিথ্যা বলছে। দু ক্ষেত্রেই এমন ব্যক্তি বর্জনীয়।"

২০০০ সালে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে 'বাঁধন হিজড়া সঙ্ঘ' নামে একটি এনজিও গড়ে ওঠে। পরের বছর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করার জন্য 'সুস্থ জীবন' নামে একটি এনজিও তৈরি করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ২০১০ নাগাদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এনজিওগুলোর কাজ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। তবে এসব এনজিও'র মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায়ের লাভ কতটুকু হয়েছে তা নিয়ে আছে মিশ্র অনুভূতি। হিজড়াদের অনেকে মনে করেন এনজিও চালানো লোকেরা নিজেরা প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলেও গরিব হিজড়াদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।

২০০৭-এর পর এনজিওগুলো 'যৌন স্বাস্থ্য'-এর বদলে 'অধিকার'-এর আলাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে। এই দাবির পেছনেও মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। নেপালে এবং পাকিস্তানের পর, ২০১৩ সালে বাংলাদেশেও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় হিজড়াদের। দেশীয় এনজিও, তাদের বিদেশি ডোনার আর বৈশ্বিক এলজিবিটি আন্দোলন এই স্বীকৃতিকে দেখে তাদের সাফল্য হিসেবে। ২০১৫-তে ঢাকায় ব্যাপক জাঁকজমকের সাথে 'হিজড়া প্রাইড' নামে মিছিল আয়োজন করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা এরই মধ্যে দেখেছি 'প্রাইড প্যারেড' বা 'প্রাইড মিছিলের' ধারণাটা সরাসরি অ্যামেরিকান সমকামী আন্দোলন থেকে আসা। এই মিছিলে হিজড়াদের পাশাপাশি দেখা

যায় বিভিন্ন পশ্চিমা দূতাবাস আর দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদের। ২ হিজড়াদের তারা সংজ্ঞায়িত করে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যাদের জন্মগতভাবে 'যৌন এবং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী'। অর্থাৎ হিজড়া বলতে মানুষ ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বোঝায়। যেহেতু তাদের সমস্যা জন্মগত, এর ওপর তাদের কোনো হাত নেই, তাই এ ধরনের মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি আছে। কোমেরি স্বীকৃতিতেও হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে'। যাদের জন্মগত সমস্যা আছে শুধু তাদেরকেই হিজড়া হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ হিজড়ার সংজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক আর বাংলাদেশের সমাজ ও সরকারের অবস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

২০১৫ সালে সামাজিকীকরণের অংশ হিসেবে মোট চৌদ্দজন হিজড়াকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মেডিক্যাল টেস্টে দেখা যায় ঢাকা থেকে বাছাই করা ১২ জন হিজড়ার মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে। তারা সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। বাকি একজনও জন্মগতভাবে সুস্থ পুরুষ ছিল, এই পরীক্ষার বছর দুই আগে স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের লিঙ্গ আর অন্ডকোষ অপসারণ করেছে সে। এর পর বারো জনেরই অ্যাপয়ন্টমেন্ট বাতিল করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাদের অবস্থানে পরিবর্তন আনে।

প্রথমত, তারা হিজড়া সনাক্তকরণে শারীরিক পরীক্ষা বাদ দিতে বলে।

দ্বিতীয়ত, হিজড়ার পাশাপাশি ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা সামনে আনতে শুরু করে।

শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারে তারা দাবি করে বসে, এতে নাকি যৌন হয়রানি হচ্ছে। অথচ ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী, বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসে কাজ করা মানুষদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা হয় নিয়মমাফিক, এ নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। কেবল হিজড়াদের ক্ষেত্রেই সমস্যা! যেখানে হিজড়াদের বিশেষ সুবিধা এবং স্বীকৃতি দেওয়াই হচ্ছে 'যৌন ও লিঙ্গ অন্ধ বা বধির হবার কারণে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষা আবশ্যক। কোনো মানুষ যদি অন্ধ বা বধির হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পায়, ভাতা পায়, তাহলে সে আসলেই অন্ধ বা বধির কি না, তা যাচাই করা জরুরি। হিজড়াদের শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে এই আপত্তি তাই একেবারেই অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এলজিবিটি নেটওয়ার্ক চায় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি। তারা মনে করেছিল, হিজড়াদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধে যখন সরকারিভাবে হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হলো 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে। কারণ, এভাবে সজ্ঞা দেওয়ার ফলে, শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারটা চলে আসলো। আর পরীক্ষা হলে স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লোকেরা কিংবা অপারেশন ছাড়াই নারী সাজা পুরুষেরা ধরা পড়ে যাবে। এদের মধ্যে আগে যারা হিজড়া বলে পরিচিত ছিল, ধরা পড়বে তারাও। অর্থাৎ ২০১৩-এর স্বীকৃতির ফলে এলজিবিটি নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য তো অর্জিত হলোই না, উল্টো দেখা দিলো সমস্যা।

এ পরিস্থিতিতে তাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল,

• হিজড়া শব্দকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা অথবা

• হিজড়ার পাশাপাশি আইনে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাও যুক্ত করা।

হিজড়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে। পত্রপত্রিকাতে প্রায়ই পথেঘাটে চাঁদাবাজি, বাসাবাড়িতে হানা দেওয়া, দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের

সাথে হিজড়াদের যুক্ত থাকার খবর দেখা যায়। এ ধরনের কার্যকলাপের কারণে সমাজের অনেকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। তবু সমাজ হিজড়াদের জায়গা দিচ্ছে, কারণ মানুষ মনে করে হিজড়ারা জন্মগতভাবে যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এ অবস্থার ওপর তাদের কোনো হাত নেই এবং তাদের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কেউ যদি এখন বলে বসে-হিজড়া আসলে শুধু জন্মগত সমস্যাযুক্ত মানুষ না, বরং শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষও স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে পারে-ঐ সহানুভূতিটুকু তখন আর থাকে না। কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারী সাজছে, সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উপদ্রব করছে, নানা অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, তারপর তারাই আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুবিধা চাইছে-এটা সমাজ মেনে নেবে না। সহানুভূতি উবে যাবে, থেকে যাবে ক্ষোভ। যার ফলাফল ভালো হবে না। কাজেই হিজড়া শব্দকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

বাংলাদেশে সক্রিয় এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তাই বেছে নেয় দ্বিতীয় রাস্তা। জোর দিতে শুরু করে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের ওপর। এতে করে একদিকে হিজড়া আর ট্র্যান্সজেন্ডারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে।

এলজিবিটি অ্যাকটিভিস্টরা এসময় থেকে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে সামনে আনতে শুরু করে। তারা আরও দুটি কাজ করে। তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ' কথাটার বিরোধিতা করে। কারণ, তৃতীয় লিঙ্গ দ্বারা আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হয়। অন্যদিকে তারা বলতে শুরু করে, 'হিজড়া' কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি'।

এ কথা বলার মূল কারণ হলো, আইনে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ঢোকানোর অজুহাত তৈরি করা। তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, হিজড়াদের তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে, তোমরা ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দ নিয়ে এত মাতামাতি করছো কেন? তখন তারা বলবে, 'হিজড়া কোনো জেন্ডার না, এটা একটি সংস্কৃতি। আর যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা সংস্কৃতি তাই অনেকে এই সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণ না-ও করতে পারে। হিজড়া নামে নিজেকে পরিচয় না-ও

দিতে পারে তারা। তাদের জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করা উচিৎ। এইসব কারণে আইনের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা থাকা দরকার।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রম :

নতুন কৌশল নেবার পর থেকে গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের এলজিবিটি নেটওয়ার্ক বর্তমানে তাদের পুরো শক্তি একত্রিত করেছে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

- ***আইন ও নীতিগত অগ্রগতি:***

বাংলাদেশে রীতিমতো আইন প্রনয়ন করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'ট্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামে এক খবরে বলা হয়েছে,

"সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্যে।"

অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে এ ধরনের বিকৃতিতে মূলস্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তা করা হচ্ছে অধিকারের নামে। ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

“ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩’ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, '... এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে”

যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ আইনের খসড়া হয়েছে এবং তা পাস করানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আছে এশিয়ান উন্নয়ন বারিয়া বিভিন্ন এনজিও এবং মার্কিন সরকার। বিষয়টি উঠে এসেছে মার্কিন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যেই।

- ***মার্কিন যোগসাজশ:***

২০২৪ এর জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা এবং ফ্লোরিডা রাজ্যের গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা অ্যামেরিকান জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের অপচয়। অন্যদিকে রন ডিস্যান্টিসের বক্তব্যের সূত্র ধরে সিএনএন জানিয়েছে, এই প্রকল্প বাইডেনের সময়ে শুরু হয়নি, ২০১৮ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, অ্যামেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একমত।

ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাতে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে;

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে তারা সহায়তা দিচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ২০২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথমবারের মতো 'তৃতীয় লিঙ্গ'-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে, লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রকল্পে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আইনের খসড়া জমা দিয়েছে, যাতে যৌন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি ট্র্যান্সজেন্ডার আইনের খসড়া জমা দিয়েছে, যাতে যৌন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং অন্যান্য অধিকার বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ, বাংলাদেশ ট্র্যান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করেছে 'নাগরিক সংগঠন'গুলো, তাও আবার ইউএসএইডের অর্থায়নে। সেই নাগরিক সংগঠন কারা?

এ প্রশ্নের উত্তর আছে ইউএসএইডের আরেক প্রতিবেদনে। Final Performance Evaluation For USAID's Rights For Gender Diverse Populations (RGDP) Activity (২০২১), শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ট্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়েছে 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' কে।

ট্যান্সজেন্ডার আইনের পেছনে বন্ধু'র ভূমিকার কথা উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনেও। বন্ধু'র ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

“সমাজসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধুর সাথে সহযোগিতা করেছে এবং ট্র্যান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের খসড়া প্রস্তুত করেছে।”

এই সহযোগিতা ঠিক কেমন তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, বন্ধু'র আরেকটি প্রতিবেদনে। এ প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্র্যান্সজেন্ডার

সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছে বন্ধু-ই। তারপর তারা সেটা জমা দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে।

বন্ধু এবং তাদের অ্যামেরিকান মনিবরা বলছে, ২০২১ সালে তারা খসড়া বানিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে ২০২২ এর মার্চ মাসে সংবাদমাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে, *'...আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি...'।*

তারপর আবার ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে বলা হচ্ছে,

"ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে'। সবশেষে ২০২৩ এর ডিসেম্বরে পত্রিকায় এসেছে, 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে।"

অর্থাৎ এজেন্ডা আর অর্থ দিয়েছে অ্যামেরিকা ও এডিবি, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আইনের খসড়া বানিয়েছে বন্ধু, আর সেটাই গৃহীত হয়ে গেছে!

ওপরের তথ্যগুলো ও স্বীকারোক্তি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশে জান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অ্যামেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের নির্দেশনায় এবং এটি করা হচ্ছে বৈশ্বিক এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ হিসেবে।

- ***পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ:***

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায়

সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেওয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'

এ গল্পে 'শরীফা' নিজেই স্বীকার করছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ। যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সে নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

'আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্র্যান্সজেন্ডার।'

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

'...এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাম বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

'... একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।'

কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের বক্তব্য। উলরিখস, হার্শফেল্ড, দ্য বোভয়া, জন মানি, হ্যারি বেঞ্জামিন, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, জুডিথ বাটলার আর জুলিয়া সেরানোদের চিন্তার জগাখিচুড়ি মিশেল। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে 'ট্র্যান্সজেন্ডার' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য থেকে যায় একই।

২৪ সালের বইয়ে শরীফার গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে- *'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'*। নতুন বইয়েও শোনানো হয়ে গেছে সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে মেয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প। ৪২ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ শেখানো আমাদের শিশুদের। এর পিছনে আছে এনজিও এবং এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। এ ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকার কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপার্সন এবং নির্বাহী পরিচালকের লেখায় বলা হচ্ছে,

“NCTB এর সাথে দৃঢ় লবিয়িং এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডার, হিজড়া এবং লিঙ্গ রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত (কম্প্রিহেনসিভ) অংশ সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।”

একই প্রতিবেদনের ৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এই আলোচনাগুলো এসেছে 'ক্লাস ৭ এর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে'।

শিক্ষাক্রমে এনজিওদের প্রভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে দেশের সংবাদপত্রগুলো পুরন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও। ২৫শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত ‘গোজামিলে তৈরি করা হচ্ছে নতুন কারিকুলাম’ প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে,

‘NCTB বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি এনজিও সংস্থার নির্দেশিকাতেই নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে...’অভিযোগ রয়েছে, ১৫ সদস্যের ওই গ্রুপের ছয়জন সদস্যকে বাইপাস করে ইউনিসেফ,প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কারিকুলাম তৈরির কাজ হচ্ছে।

- ***মিডিয়া:***

গত ২/৩ বছর ধরে মিডিয়াতে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং পরিচয়কে তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। নিউজ মিডিয়াতে নিয়মিত আসছে নানা প্রতিবেদন। বিনোদন জগতের মাধ্যমেও প্রচারণা চালানো হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতে নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রানার্সআপও হয়েছে। নারী সাজা পুরুষদের অতিথি হিসেবে আনা হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের

টকশোতে। তাদের মডেল বানিয়ে আলাদাভাবে নিউজ করা হয়েছে পত্রিকার ফ্যাশন সাময়িকীতে।

এ খবরগুলো দেখতে থাকলে যেকোনো মানুষের মনে হতে পারে, হয়ত আমাদের সমাজে দিন দিন 'ট্রান্সজেন্ডার' মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাদের এত ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা তা না। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে, যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আনা যায়। মিডিয়াতে আসা এই সব ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে একই দাতা এনজিও অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের অংশ।

ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচক কিছু লিখলেই 'পুরষ্কার' পাচ্ছে সাংবাদিকরা। এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। 'বন্ধু'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ৫৬ জন সাংবাদিককে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' নিয়ে পুরুস্কৃত করেছে তারা। এছাড়া একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে 'ট্র্যান্স টক' নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে 'বন্ধু'। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরণের কাজ।
'বন্ধু'র ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের 'দক্ষ ওয়াচডগে' পরিণত হয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মেনে নেওয়ার ফলাফলঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মেনে নেওয়ার পরিণতি হবে বিধ্বংসী। এর ফলাফল হবে,

- ঘৃণ্য সমকামী এজেন্ডার আইনী স্বীকৃতি;

- নারী ও পুরুষের সীমারেখা মুছে ফেলা;
- পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর 'বিয়ে'-কে অর্থাৎ সমকামিতাকে বৈধতা দেয়া;
- নারীর জন্য নির্ধারিত স্থানে পুরুষের অনুপ্রবেশ;
- কিশোরী ও নারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি বেড়ে যাওয়া;
- নারীদের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধাগুলো পুরুষদের হাতে চলে যাওয়া;
- উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনসহ পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা;
- পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া;

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের আলেম উলামাদের মতে ট্রান্সজেন্ডার এবং সমকামের মতো বিষয়গুলো মেনে নেয়া নৈতিক অধঃপতনের পাশাপাশি প্রজন্মকে নিয়ে যাবে জঘন্য হারাম,এমনকি কুফরের দিকে।

এগুলো নিছক কল্পনা নয়। এমন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। নিজেকে নারী দাবি এক পুরুষকে সিট দেওয়া হয়েছে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে। এ দেশের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আসন সংকটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় না। অথচ সেখানে যৌন বিকারগ্রস্থ ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য আলাদা কোটা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু-

কিশোররা সহজে প্রভাবিত হয়, নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজাত আগ্রহ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি কিশোরদের সামনে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরছে সমাজ ও সভ্যতার শত্রুরা।

বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই নানা মনস্তাত্তিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। তার উপর লিঙ্গ নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে এমন মগজধোলাই কিশোর কিশোরীদের বিপথগামী করবে। তাদের জীবন বিষিয়ে তুলবে। জন্ম নিবে নানা ধরণের অসুখ ও অসঙ্গতি।

সপ্তম শ্রেণীর বইতে বলা কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারও ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যা খুশি করা যায় এই মূলনীতির মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতা, "সমকামী বিয়ে" থেকে শুরু করে ব্যভিচারসহ প্রায় সব ধরণের বিকৃত যৌনাচার ও জীবনাচরণকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। সকল মূল্যবোধ মুছে গেছে। পশ্চিমা বিশ্বের পরিবারগুলো ভেঙ্গে পড়েছে। সারাজীবন সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করে যাওয়া পিতামাতাকে বুড়ো বয়সে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। আমরা তো অবশ্যই এমন সমাজ চাই না।

বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের দায়িত্বঃ

- ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভায়বহতা সম্পর্কে নিজে জানা এবং অন্যকে জানানো।
- ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দল মত ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সচেতন করা।

- আপনার আদরের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা। কেউ যেন তার মগজধোলাই করতে না পারে। কেউ যেন তাকে মানসিক ও যৌন বিকারগ্রস্থ্ বানিয়ে তার জীবন নষ্ট করতে না পারে।

- পাঠ্যবইয়ে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করা

- আমেরিকা, পোলান্ডসহ অন্যান্য অনেক দেশে অভিভাবকেরা এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছেন। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদেরও সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহতার বাস্তবরূপ

- ***ঘটনা ১:*** *ত্রিশ বছরের ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামের এক আসামি ৯ বছর জেলে থাকার পর নিজেকে মহিলা দাবী করে! আদালত তার দাবী মেনে নেয় এবং মহিলা কারাগারে পাঠায়! সেখানে তার সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে দু'জন মহিলা গর্ভবতী হয়! এ ঘটনার পর তাকে আবার পুরুষদের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। [Source: New York Times,2022]*

- ***ঘটনা ২:*** *উৎস ইসলাম মন্ডল নামের এক ছেলে ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নাম নিয়েছিল রাদিয়া তেহরীন উৎস। এই নামে গত সেপ্টেম্বারে McCoy নামক এক ক্লোদিং ব্র্যান্ডের আয়োজিত গুলশানের Six Seasons Hotel এ অনুষ্ঠিত বিউটি প্যাজেন্ট Miss Evergreen Bangladesh এ সিলেকশানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু,*

দূর্ভাগ্যবশত সে রীতিমত ফেইসবুকে পোস্ট দিয়ে এক বিল্ডিংয়ের ছয় তালা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। [Source: The daily Campus]

- ***ঘটনা ৩:*** *ক্রিস বেক (৫৫), প্রথম প্রকাশ্য ট্রান্সজেন্ডার ইউএস নেভি সিল জানিয়েছেন "লিঙ্গ পরিবর্তন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।"*
  তিনি তার জন্মগত লিঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন। ট্রান্সজেন্ডার অবস্থায় নাম বদলে রেখেছিলেন ক্রিসটিন বেক।

বেকের দাবি, ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্সের (Veterans Affairs) ডাক্তাররা এবং এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা তাদের উগ্র ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডা নরমালাইজ করার জন্য তাকে ব্যবহার করেছে।

তিনি আরও জানান, "কেবল একটি মাত্র পরামর্শ সেশনের পরই তাকে হরমোন দেয়া শুরু করেন ডাক্তার। গত দশ বছরে আমার সাথে যা যা ঘটেছে তা আমার জীবন তছনছ করে দিয়েছে। আমি নিজেই আমার জীবনটা ধ্বংস করেছি। আমি ভিক্টিম নই। আমি স্বেচ্ছায় এসব করেছি। কিন্তু এসব কাজে আমি সাহায্য পেয়েছি। আমি সিএনএন-এ গিয়েছি আরও কত কি! এজন্যই আজ আমি এই অবস্থায় এখানে। আমি আমার ভুলগুলো শোধরাবার চেষ্টা করছি।"

"আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে... আমি বোকা ছিলাম, আমার অবস্থাও তখন খারাপ ছিল। আর আমার সেই অবস্থার সুযোগ নেয়া হয়েছে। আমাকে প্রোপাগান্ডা গেলানো হয়েছে। কিছু ধূর্ত লোক আমাকে খুব বাজেভাবে ব্যবহার করেছে। তারা ঠিকই জানত তারা কি করছে, কিন্তু আমি জানতাম না",

[রবি স্টারবাকের সাথে এক পডকাস্টে বেক এ কথা জানিয়েছেন। বেক এখন এমন তরুণদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করছেন যারা তার মতই এমন ভুল পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।]

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্র্যান্সজেন্ডার

আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এর বাইরে ট্র্যান্সজেন্ডার, তৃতীয় লিঙ্গ, জেন্ডার ফ্লুয়িড,নন-বাইনারি যা কিছু আছে সব মানুষের তৈরি শ্রেণিবিভাগ। ইসলাম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে নারী এবং পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। মুসলমান হিসেবে আমরা স্বীকার করি যে, নারী ও পুরুষের দেহের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য ও ভূমিকা আছে,যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দেহের পাশাপাশি সৃষ্টিগতভাবেই নারী ও পুরুষের চিন্তা,চরিত্র, এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। শরীয়াহ এই পার্থক্য গুলোকে আমলে নেয়।

দেহ ও জেন্ডারের পার্থক্য ইসলাম করে না। জেন্ডার আধুনিক পশ্চিমের কিছু তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের তৈরি করা বানোয়াট ধারণা,শরীয়াহতে যার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। শরীয়াহতে জন্মগত লিঙ্গ এবং মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। ব্যক্তির কী 'মনে হয়' তা দিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বদলায় না। মহান আল্লাহ তায়ালা দেহ এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। আল্লাহ যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন সে পুরুষ। যাকে তিনি নারীদেহ দিয়েছেন তিনি নারী। এবং আল্লাহ ভুল করেন না। কেউ ভুল দেহে জন্মায় না।

মানুষের কোনো অধিকার নেই সুস্থ সবল দেহ সার্জারি করে পরিবর্তন করা। শারীরিক অসুস্থ,ক্ষত কিংবা ত্রুটি থাকলে সেটা ভিন্ন বিষয়। স্বেচ্ছায় সার্জারি করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া তো স্বয়ং খোদার সাথে বিদ্রোহ করার সামিল!

মানুষের দেহে নারী-পুরুষ হিসেবে এই পার্থক্য ও ভিন্নতা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সৃষ্টিগত এই ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণ যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত বিধান, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তেরও বিধান। শরীয়তের দৃষ্টিতে কারো জন্য এই ভিন্নতায় হস্তক্ষেপের কোনো রকম সুযোগ নেই। আর মানুষের মাঝে নারী ও পুরুষ হিসেবে দৈহিক ও গঠনগত যে ভিন্নতা রয়েছে, এর উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণির মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই পরস্পর আকর্ষণবোধও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার কারণে উভয় শ্রেণি পরস্পর শারীরিক সম্পর্কের প্রয়োজন বোধ করে। যার ভিত্তিতে সন্তান জন্ম হয় এবং মানবজাতির বংশ বিস্তার হয়। আর এ শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টিও আল্লাহর দেওয়া বিধান মতেই হতে হবে।

স্রষ্টার বিধানের বাইরে কোনো নারী-পুরুষের জন্য শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো হারাম। একই কারণে পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোর কোনও সুযোগ নেই। তা সম্পূর্ণ হারাম ও চরম ঘৃণিত কাজ।

এই হচ্ছে নারী-পুরুষের শ্রেণি ভিন্নতা ও লিঙ্গ নির্ধারণ এবং পরস্পরের শারীরিক সম্পর্ক বিষয়ক আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান। এবং এ অনুযায়ী শুরু থেকেই মানবজাতির জীবনধারা ও সমাজ ব্যবস্থা চলমান। নগণ্য কিছু বিকৃত রুচি ও বিকৃত মনমানসিকতার লোক, যারা নারী-পুরুষের বৈবাহিক বৈধ সম্পর্ক বাদ দিয়ে যিনা-ব্যভিচার এবং সমকামিতায় আগ্রহী, শুধু তারাই আল্লাহর দেওয়া বিধান ও সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত। এই কুরুচিপূর্ণ ও অবাধ যৌনাচারের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে বর্তমানকালে প্রকাশ পায় 'ট্রান্সজেন্ডারবাদ'।

মানুষের চিরায়ত ও সুস্থ রুচি-প্রকৃতির পরিপন্থী এবং ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহবিরোধী এই কুফরি মতবাদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করার

শাশ্বত নিয়ম ভেঙে দিয়ে মানবসমাজকে মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সব দিক থেকে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

- ***লিঙ্গ পরিবর্তনের শরয়ী হুকুম:***

স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন: যদি কেউ নিজের অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থি ও লিঙ্গগত অঙ্গের ভিত্তিতে পরিপূর্ণরূপে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের হয়, যেমন পরিপূর্ণ পুরুষ অথবা নারী হয়, তথাপি কোনো কারণে মানসিকভাবে সে নিজের এই লিঙ্গকে মেনে নিতে প্রস্তুত না, তাহলে তার এই অবস্থাকে একটি মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে শারীরিক কোনো রোগ নয়। এমনিভাবে কেবল ব্যক্তিগত আগ্রহ ও প্রবৃত্তির কামনার কারণে নিজের লিঙ্গকে পরিবর্তন করার দাবিও শরয়ী হুকুমের জায়গায় একই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই অবস্থাতে একজন পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের মানুষ লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য যেসব মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করে, এগুলোর মাধ্যমে কখনোই তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ কখনোই একজন নারী হতে পারে না। একইভাবে একজন পূর্ণাঙ্গ নারীও কখনো একজন পুরুষ হতে পারে না। ফলে এসব মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণের পর একজন মানুষ ক্রোমোজমের জায়গায় পূর্ববর্তী লিঙ্গেই বহাল থাকে। এমনিভাবে বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যাবলি যেমন পুরুষের ভেতর গর্ভধারণ,মাসিক ইত্যাদির ক্ষমতা তৈরি হয় না। কেবল বাহ্যিক কিছু অঙ্গ ও আলামত পরিবর্তন হয়।

এই অবস্থায় শরয়ী হুকুম হলো,এটি অকাট্যভাবে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন। যা সম্পূর্ণ নাজায়েজ এবং হারাম।

- ***কুরআন ও হাদীসের আলোকে লিঙ্গ পরিবর্তনের শরয়ী বিধান:***

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

রাবেতা আলমে ইসলামীর ফিকহী বোর্ড আল মাজমাউল ফিকহুল ইসলামিয়্যু ১৯৮৯ সালের ১৯-২৬ ফেব্রুয়ারিতে মক্কা মোকাররমায় অনুষ্ঠিত তাদের ১২তম সেমিনারে লিঙ্গ পরিবর্তন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছে। বোর্ডের সদস্যদের মাঝে আলোচনা-পর্যালোচনার পর তারা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে:

প্রথমত, পূর্ণাঙ্গ (সুস্থ ও সুস্পষ্ট) শারীরিক অঙ্গধারী পুরুষ ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক অঙ্গধারী নারীর জন্য লিঙ্গ পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরিত হওয়া বৈধ নয়; বরং এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। কারণ, এটি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির পরিবর্তনকে শয়তানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করেছেন। শয়তানের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন,

وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

'তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।'

এ আয়াতের স্পষ্ট প্রতিফলন আজ আমরা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মধ্যে দেখতে পাই। ট্র্যান্সজেন্ডার আক্ষরিক অর্থেই একটি শয়তানি এজেন্ডা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

'আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৯]

দ্বিতীয়ত, যার মাঝে নারী ও পুরুষ উভয়ের আলামত একত্রিত হয়েছে,তার ক্ষেত্রে আলামতের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। যদি তার মাঝে পুরুষত্বের আলামত প্রাধান্য পায়, তাহলে তার জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তার পুরুষ লিঙ্গের অস্পষ্টতা দূর করা বৈধ। আর যদি নারীত্বের আলামত প্রাধান্য পায়, তাহলে তার জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে নারী লিঙ্গের অস্পষ্টতা দূর করা বৈধ। সেটা সার্জারির মাধ্যমে হোক কিংবা হরমোনাল থেরাপির মাধ্যমে হোক। কারণ, এই অবস্থাটা মূলত একধরনের অসুস্থতা। আর চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করাই উদ্দেশ্য, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন নয়।

*হাদিস শরীফে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য বরণকারী নারী ও নারীদের সাথে সাদৃশ্য বরণকারী পুরুষের ওপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। যেখানে কেবল সাদৃশ্যের জন্য অভিশাপ করা হয়েছে, সেখানে রীতিমত অপারেশনের মাধ্যমে অন্য লিঙ্গের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের জঘন্যতা ও নিষিদ্ধতা আরও আগেই প্রমাণিত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

“নারীদের বেশধারী পুরুষ ও পুরুষদের বেশধারী নারীদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। এবং বলেছেন, তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। এরপর তিনি অমুককে ঘর থেকে বের করে দিলেন, উমর (রা:) ও আরেকজনকে বের করে দিলেন।” [সহীহ বুখারী,৮/১৭১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়েত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। -[সূরা নিসা ৪: ১১৫]

কিছু প্রশ্ন এবং উলামায়ে কেরামের উত্তর সংযোজন

ক. *ট্রান্সজেন্ডারবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?*

= *"ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ। যা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির চরম বিকৃতি এবং তাঁর দেওয়া শরীয়ত ও কুরআন সুন্নাহের বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। একইসাথে তা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ, সুস্থ রুচিবোধ পরিপন্থী ও সমাজ বিধ্বংসী মতবাদ। বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত এ মতবাদটি ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক পর্যায়ের হারাম ও ভয়াবহ কবীরা গুনাহ এবং ভয়ংকর কুফরি মতবাদ। শরীয়তে যেখানে নারী-পুরুষের পরস্পর বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বন করাকেই লানত করা হয়েছে সেখানে ট্রান্সজেন্ডারিজমে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যই নয়; বরং নারী- পুরুষের সৃষ্টিগত লিঙ্গপরিচয়কেই পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। এটা যে ভয়াবহ গযব ও লানতের কাজ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।"*

খ. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার কি এক, না ভিন্ন?

= *"হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার এক নয়; সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। ইসলামের দৃষ্টিতে তো নয়ই, বাস্তবতার ভিত্তিতেও এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিজড়া হওয়া সৃষ্টিগত ও জন্মগত বিষয়। এটি একটি শারীরিক ত্রুটি। আর ট্রান্সজেন্ডার হল সম্পূর্ণ মানসিক একটি বিষয়। বাস্তবে পুরুষ*

হয়েও নিজেকে নারী মনে করলে সে রূপান্তরিত নারী। তদ্রূপ বাস্তবে নারী হয়েও নিজেকে পুরুষ মনে করলে সে রূপান্তরিত পুরুষ। এ হল ট্রান্সজেন্ডারবাদ। হিজড়াকে এর সাথে মেলানোর সামান্যতমও সুযোগ নেই। না শরয়ী দৃষ্টিতে, না বাস্তবতার বিচারে। হিজড়া হয়ে জন্মগ্রহণ করা কোনো অপরাধ নয়। শরীয়তে হিজড়াদের বিষয়ে যাবতীয় বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে। ঈমানের সাথে শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চললে তারাও আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হতে পারে। অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ কুফর ও জঘন্য অপরাধ। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলার লানত ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানত। তবে মনে রাখা দরকার, যারা বাস্তবে হিজড়া না হয়েও হিজড়ার রূপ ধারণ করে, অথবা পুরুষ হিজড়া হয়ে নারীর বেশ ধারণ করে বা নারী হিজড়া হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে বা আরো অবক্ষয়ের শিকার হয়ে আজকালের এ কুফরি মতবাদ ট্রান্সজেন্ডারবাদকে নাউযুবিল্লাহ- সঠিক মনে করে তারাও আল্লাহর লানতের শিকার হবে।"

গ. হরমোন থেরাপি বা সার্জারির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তনের অনুমতি আছে কি? পরিবর্তন না করেও নিজেকে নিজে বিপরীত লিঙ্গের মনে করা এবং তা ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

= "হরমোন থেরাপি বা সার্জারির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই; বরং তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে হস্তক্ষেপ। এগুলোর মাধ্যমে শারীরিক কাঠামো পরিবর্তন করে ফেলা, অনুরূপভাবে পরিবর্তন না করেও নিজেকে নিজে বিপরীত লিঙ্গের মনে করা বা ঘোষণা দেওয়া জঘন্য পর্যায়ের হারাম। এ উভয় ধরনের ব্যক্তির উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের লানত। আল্লাহ না করুন কেউ এ ভয়াবহ গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলে তার কর্তব্য অতি দ্রুত তওবা করে ফিরে আসা।"

ঘ. মুসলিম দেশে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন এবং এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী?

= "ট্রান্সজেন্ডারবাদ মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ, ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সম্পূর্ণ কুফরি মতবাদ। যা সংসার, পরিবার, সমাজ সর্বোপরি গোটা দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয়কর। তাই কোনো মুসলিম দেশের জন্য এমন বিপর্যয়কর, সমাজ বিধ্বংসী কুফরি মতবাদের অনুমোদন ও স্বীকৃতিদান কিছুতেই বৈধ হবে না। মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব, ইসলাম বিরোধী ও সমাজ বিধ্বংসী এ মতবাদ থেকে দূরে থাকা। দাওয়াতের মাধ্যমে শক্ত জনমত গড়ে তোলা। প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থান থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী এর প্রতিকারে কাজ করা। কোনোক্রমেই যেন এমন আইন অনুমোদন না হয় সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং সাধ্যানুযায়ী শরীয়তসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উল্লেখ্য, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ব্যাপারে পুরো বিশ্বের সকল মুফতিগণ একমত। তাদের সবাই একে হারাম বলেছেন এবং ইসলামী শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হল।

১. 'ওআইসি'র প্রতিষ্ঠান জিদ্দা ফিকহ একাডেমি, সিদ্ধান্ত ২৫১ (১৩/২৫)

২. রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত (ক্বারারাতুল মাজমা আলফিকহি আলইসলামী, পৃষ্ঠা: ২৬২)

৩. সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র সিদ্ধান্ত, নং ১৭৬

৪. সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বোর্ড 'আললাজনাতুদ দায়িমাহ'র ফতোয়া ২৫/৪৭।"

উপসংহার: উপরিউক্ত সকল পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় যে, ট্র্যান্সজেন্ডাররা সুস্থ-স্বাভাবিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও তাদের সমস্যা একান্তই মানসিক ও চিন্তাগত। অসুস্থ মানসিকতা কিংবা বিকৃত চিন্তাচেতনায় আক্রান্ত হয়ে তারা নিজেদেরকে জন্মগত লিঙ্গ থেকে ভিন্ন হিসেবে কল্পনা করতে থাকে। ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন তাদের এই অসুস্থ ও বিকৃত ধ্যানধারণাকেই অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ও আন্দোলন একটি বিকৃত ও ঈমানবিধ্বংসী আন্দোলন। ইসলাম কখনোই জন্মগত লিঙ্গকে অস্বীকার করার অনুমোদন দেয় না, ইসলাম কখনোই মানুষের জন্মগত লিঙ্গকে বিকৃত করার অনুমোদন দেয় না, ইসলাম কখনোই পুরুষ ও নারীর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গের স্বীকৃতি দেয় না। এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান একেবারেই সুস্পষ্ট। কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে না, মেনে নিতে পারে না।

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন পুরো মানবসমাজের জন্যই একটি ক্ষতিকর আন্দোলন। এই আন্দোলন মানুষের ফিতরাত বিকৃতির, এই আন্দোলন আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতির, এই আন্দোলন আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তনের। আর যারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের মতো জঘন্য খেলায় নিমজ্জিত হয়, মহান আল্লাহ তাদের ওপর লানত করেন। মুসলিম হিসেবে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হলো, নিজেদের পরিবার, সমাজ ও দেশকে অভিশপ্ত এই আন্দোলন থেকে বাঁচানো। যারা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, আমাদের সন্তানদের মাঝে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও সোচ্চার হওয়া।

থিসিস পেপারটি লিখতে যেসকল বই এবং সোর্সের সাহায্য নিয়েছি

১. বই: অবক্ষয়কাল; অধিকারের মোড়কে বিকৃতির আন্দোলন
লেখক: আসিফ আদনান।

২. অভিশপ্ত রংধনু
লেখকগণ: মাওলানা জাফিরুদ্দিন; আসিফ আদনান; ড্যানিয়েল হাকিকাতজু; ডা. শামসুল আরেফীন

৩. বই: ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার
লেখক: মুফতী ফিদাউল্লাহ

৪. ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে বাংলাদেশের আলেমদের সম্মেলিত ফতোয়া যা হাইয়াতুল উলইয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই ফতোয়া দেশের শীর্ষ কয়েকজন মুফতির তত্ত্বধানে তৈরি হয়েছে, যারা হলেন,

ক. মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (মারকাজুদ দাওয়াহ)
খ. মুফতি আব্দুস সালামা সাহেব (ফরিদাবাদ মাদরাসা)
গ. মুফতি মিজানুর রহমান সাইদ সাহেব (শায়খ যাকারিয়া)
ঘ. মাওলানা মাহফুজ সাহেব।

৫. লিফলেট- অভিভাবক সমীপে... পাঠ্যপুস্তকে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ (সতর্কতা ও করণীয়)